শিক্ষক- রাসপতি মণ্ডল (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি) বঙ্গবাসী কলেজ , কোলকাতা ।

দর্শনের আলোকে নাস্তিক আস্তিক সমাচার

দর্শন শাস্ত্রে বিশেষত ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রমতে আস্তিক- নাস্তিকদের সংজ্ঞা একটু অন্যরকম, কিছুটা মজারো বটে। ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়গুলোকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়- নাস্তিক ও আস্তিক।

নাস্তিক সম্প্রদায় প্রধানত: তিনটিঃ

১। চার্বাক

২। বৌদ্ধ

৩। জৈন

আস্তিক সম্প্রদায় প্রধানত: ছয়টিঃ

১। সাংখ্য

২। যোগ

৩। ন্যায়

৪। বৈশেষিক

৫। পূর্ব-মীমাংসা বা মীমাংসা

৬। উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত

কিন্তু এখানে আস্তিক মানে বেদ-বিশ্বাসী, নাস্তিক মানে বেদ-বিরোধী; – ঈশ্বরে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস আসলে প্রাসঙ্গিকই নয়। যাঁরা ঈশ্বর মানেননা তাঁরা যদি নাস্তিক হতেন, তবে মীমাংসকাচার্য ও

শিক্ষক- রাসপতি মণ্ডল (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি) বঙ্গবাসী কলেজ , কোলকাতা ।

সাংখ্যাচার্য নাস্তিক বলে অভিহিত হতেন, কেননা তাঁরা ঈশ্বর মানেন না। অধিকন্তু ঈশ্বর নাই- ইহা প্রচলিত সাংখ্য-দর্শনে যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

আবার, যাঁরা ঈশ্বর মানেন না, গীতাতে ভগবান তাঁদেরকে অসুর-সম্পদ-যুক্ত বলে নির্দেশ করেছেন, নাস্তিক বলেননি। মীমাংসকাচার্য ও সাংখ্যাচার্য ঈশ্বর মানেননা, কিন্তু বেদের অনুসারী। তাই তাঁরা নাস্তিক নন, অতিশয় আস্তিক। অপরদিকে, চার্বাক দর্শনে, বৌদ্ধদর্শনে বেদের প্রমান অঙ্গীকৃত হয় না বলে তা নাস্তিক।

এবার ইসলাম ধর্মে শব্দদুটিকে দেখা যাক। এখানে আস্তিক শব্দের কাছাকাছি শব্দ হচ্ছে- মু'মিন বা ঈমানদার। এই ঈমান কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহে বিশ্বাস, সাথে সাথে আল্লাহর রাসুল হিসাবে মুহাম্মাদ সা. এর উপরও বিশ্বাস (কালেমা তাইয়েবা)। আর নাস্তিক্যের কাছাকাছি শব্দগুলো হচ্ছে-
১। কুফর

২। শিরক

৩। মোনাফেকি

তবে সম্ভবত সবচেয়ে কাছের শব্দটি হবে কুফর। একইভাবে এই শব্দগুলো সাধারণভাবে ঈশ্বরকে নির্দেশ না করে সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি অনাস্থা/অবিশ্বাস/অংশীদ্বারকে নির্দেশ করে। 'কুফর' হচ্ছে আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় হিসাবে অস্বীকার করা। সেক্ষেত্রে আল্লাহকে অস্বীকার করে অন্য কোন ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করলেও সে কাফির। শিরক হচ্ছে অংশীদার করা- অর্থাত আল্লাহর গুনসমূহে অন্য কাউকে অংশীদার করলে তা হয় শিরক; সে হিসাবে পৌত্তলিকতা বা মূর্তি-পূজা শিরক। এই শিরককে কিন্তু ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। উল্টোদিকে 'মোনাফেকি'ও আল্লাহে অবিশ্বাস- কিন্তু এটা হলো তাদের ক্ষেত্রে যারা মুখে বা উপরে-উপরে বিশ্বাস প্রদর্শন করে কিন্তু অন্তরে অবিশ্বাস ধারণ করে।

আবার, প্রচলিত অর্থে শব্দটিকে বিচার করি। ধর্ম পালনকারীদের সাধারণভাবে নাস্তিক বলা হয় না, তা সে ধর্মে ঈশ্বরকে অস্বীকার করা হলেও। অনেক সময়ই পৈত্রিক ধর্মকে অস্বীকারকারীকে নাস্তিক বলা হয়। একজন মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণকারী কেউ হিন্দুধর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুললে বা হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণকারী একজন ইসলামধর্মের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন তুললে, তাকে হয়তো নাস্তিক বলা হয় না, কিন্তু যখন কেউ তার পৈত্রিক ধর্মের বিভিন্ন বিশ্বাস নিয়ে ক্রমাগত প্রশ্ন তুলতে থাকে এবং নতুন কোন ধর্মে নিজেকে সমর্পিতও না করে- তখন তাকে কখনও কখনও নাস্তিক বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু এখানেও বিপত্তি আছে। এখন যদি কেউ বলে- সে প্রচলিত কোন ধর্মের অনুশাসন মানে না, বিশ্বাসও করে না; কিন্তু সে জগত-সংসারের সৃষ্টিকর্তা একজন কেউ আছে বলে বিশ্বাস করে- তবে তাকে কি বলে আখ্যায়িত করা হবে? আস্তিক না নাস্তিক? .....।

শিক্ষক- রাসপতি মণ্ডল (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি) বঙ্গবাসী কলেজ , কোলকাতা ।

একের সংযোজনঃ

উপরের প্রশ্নের উত্তরে কেউ বলেছেন- তাকে নাস্তিক বলতে হবে, কেউ বলেছেন আস্তিক আবার কেউ বলেছেন সংশয়বাদী। এবং সংশয়বাদ নিয়ে অনেকে একটা ভালো আলোচনাও করেছেন। তাই এবারে সংশয় নিয়ে কিছু কথা বলি।

সংশয়বাদীদের কথা আসলে একালের দার্শনিকদের মধ্যে বার্ট্রান্ড রাসেলের কথা সর্বাগ্রে আসে। তাঁর 'দি প্রব্লেমস অব ফিলসফি' গ্রন্থ আরম্ভই করেছেন তিনি এভাবে, "এমন কোন সুনিশ্চিত জ্ঞান কি আছে যাকে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও সন্দেহ করবে না?" দর্শনের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "সাধারণ চোখে যাকে জ্ঞান বলে মনে হয়, তার সম্বন্ধে আমাদের মনে সংশয় জাগে এবং এ সংশয়ের উত্তর পাওয়া যেতে পারে কেবল এক বিশেষ ধরণের অনুসন্ধানের মাধ্যমেই। এই অনুসন্ধানের আমরা নাম দেই দর্শন"।

এতো গেল হালের দার্শনিকের কথা। সে আমলে সংশয়বাদী দার্শনিকের কথাও একটু শুনে নেই। গ্রীক দার্শনিক পাইরো (৩৬৫-২৭০ খৃষ্টপূর্ব) বলেন, "আমরা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ দ্বারা বস্তুর বৈশিষ্ট নয়, এর বাহ্যিক রূপটাকেই শুধু জানতে পারি"। তাঁর মতে, "হয়তো কোন যুক্তির বিপরীত আরও মজবুত প্রামান্য যুক্তি পাওয়াও সম্ভব"। "কোন বস্তুর সংজ্ঞা নির্ণয় করতে হলে প্রমান দরকার- যা কিনা নিস্ফল তর্ক; আবার তাকে খন্ডানোর জন্য নতুন প্রমান চাই"। এই পাইরো কিন্তু সেকালের স্টোয়িকদের ঈশ্বরবাদকে ক্রমাগত যুক্তি দিয়ে খন্ডন করে গেছেন। সে আমলে আমাদের দেশের নাগার্জুনও কিন্তু পাইরোর অনুরূপ মত ধারণ করতেন।

এবার তাহলে আমাদের ভারতীয় দর্শনের দিকে একটু তাকাই। অনেকান্তবাদ ও স্যাদবাদ- খুবই চিত্তাকর্ষক ও মজার এই মতকে কি বলবেন? নিরীশ্বরবাদী জৈনধর্মের আধার হলো স্যাদবাদ। তা কিন্তু আবার এসেছে সঞ্জয় বেলট্বিপুত্বের অনেকান্তবাদের হাত ধরে। সঞ্জয় পরলোক, দেবতা প্রভৃতি তত্বের নিশ্চয়াত্মক রূপে কিছু বলতে অস্বীকার করেন এবং সেই অস্বীকারকেও চার প্রকার বলে বর্ণনা করেন-
১। আছে? – বলা যায় না।

২। নেই? – বলা যায় না।

৩। আছেও আবার নেইও? – বলা যায় না।

৪। আছে নেই আবার নাও নেই? – বলা যায় না।

শিক্ষক- রাসপতি মণ্ডল (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি) বঙ্গবাসী কলেজ , কোলকাতা ।

এই চারের সাথে আরও তিন যুক্ত করে জৈনধর্মের সপ্তরূপ তথা তাদের স্যাদবাদঃ

১। আছে? – হতে পারে (স্যাদ আস্তি)।

২। নেই? – নাও হতে পারে (স্যাদ নাস্তি)।

৩। আছেও আবার নেইও? – হতেও পারে নাও পারে (স্যাদাস্তি চ নাস্তি চ)।

৪। স্যাদ কি একটা বক্তব্য? – না, অবক্তব্য।

৫। স্যাদাস্তি কি একটা বক্তব্য? – না, অবক্তব্য।

৬। স্যাদ নাস্তি কি একটা বক্তব্য? – না, অবক্তব্য।

৭। স্যাদ আস্তি চ নাস্তি চ কি একটা বক্তব্য? – না, অবক্তব্য।

একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে- ধরুন সামনে রাখা একটা কলমকে দেখে প্রশ্ন করা হলো-

১। কলম কি আছে?- থাকতে পারে (স্যাদ আস্তি)।

২। কলম কি নেই?- নাও থাকতে পারে (স্যাদ নাস্তি)।

৩। কলম আছে না নেই? – থাকতে পারে নাও পারে (স্যাদাস্তি চ নাস্তি চ)।

৪। স্যাদ কি একটা বক্তব্য? – অবক্তব্য।

৫। স্যাদাস্তি কি একটা বক্তব্য? – অবক্তব্য।

শিক্ষক- রাসপতি মণ্ডল (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি) বঙ্গবাসী কলেজ , কোলকাতা ।

৬। স্যাদ নাস্তি কি একটা বক্তব্য? – অবক্তব্য।

৭। স্যাদ আস্তি চ নাস্তি চ কি একটা বক্তব্য? – অবক্তব্য।

কিছু বোঝা গেলো?

কি বলবেন?

দুইঃ গৌতম বুদ্ধ

..... যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস/ অবিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই আস্তিক/নাস্তিকের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেন, তবে তাকে আস্তিক বলতে হবে বৈকি!

এই সমস্যা দূরীকরণে দার্শনিকগণ আরো দুটি শব্দ ব্যবহার করেন- ঈশ্বরবাদী ও নিরীশ্বরবাদী। জৈন, বৌদ্ধ প্রমুখ ধর্মে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হওয়ার দরুন তাদেরকে নিরীশ্বরবাদী বলতে হবে এবং নিরীশ্বরবাদী অর্থে ব্যবহার করলে ঐসব ধর্মকে নাস্তিকও বলতে হবে। এই ঈশ্বরবাদ বনাম নিরীশ্বরবাদ কিন্তু দর্শন শাস্ত্রে শুধু কিছু অন্ধ-বিশ্বাসের বেড়াজলে আবদ্ধ গুরুবাদী বিদ্যা নয়, বরং ভাববাদ বনাম জড়বাদ বা সেই আমলের আস্তিক বনাম নাস্তিক (বেদ-বিশ্বাসী বনাম বেদ-বিরোধী) বিতর্কের মতই ধারাবাহিক তর্ক-বিতর্ক-যুক্তির হাত ধরেই অগ্রয়মান, গভীর উপলব্ধি ও চিন্তার খেলায় ভাস্কর। আমাদের ভারতীয় দর্শনেও সেই আমলে নিরীশ্বরবাদীদের যুক্তি, যুক্তি করার ধরণ, চিন্তার গভীরতা শুধু চিত্তাকর্ষকই নয়, বরং বিপ্লবাত্মকও বটে। চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, সাংখ্য, মীমাংসা প্রভৃতি দার্শনিক সম্প্রদায় একাধারে যেভাবে এবং যে যে যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরকে খন্ডন করেছে মাঝে মাঝে মনে হয় আজও তা প্রাসঙ্গিক।

এবারে আসুন, তাঁদের কিছু যুক্তি দেখি। প্রথমেই বুদ্ধ বা গোতম বুদ্ধ বা গৌতম বুদ্ধঃ *" 'বাশিষ্ঠ!.....ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মনের মধ্যে এমন একজনও নেই যিনি নিজের চোখে ব্রহ্মাকে দেখেছেন। .....এক আশ্চর্য.... এক আচার্য-প্রাচার্য..... সপ্ত-পর্যায় ধরেও আচার্যই হতে পারে না.... ব্রাহ্মনগণের পূর্বজ ঋষি, মন্ত্রকর্তা, প্রবক্তা.... অষ্টক,বামক, বামদেব, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, অঙ্গিরা, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, ভৃগু..... এদের মধ্যে কি কেউ ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দেখেছেন? .....যাঁকে দেখেননি, জানেননি তাঁরই অস্তিত্ব নিয়ে উপদেশ*

শিক্ষক- রাসপতি মণ্ডল (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি) বঙ্গবাসী কলেজ , কোলকাতা ।

করেন!..... বাশিষ্ঠ! এ যেন সেই অন্ধগণকে ক্রমপর্যায়ে পংক্তিবদ্ধ করা; প্রথমজনও দেখতে পায় না, দ্বিতীয়জনও দেখতে পায় না, তৃতীয়জনও নয়.../'" (তেবিজ্জসূত্র, ১/১৩)।

এখানে বলে রাখা দরকার যে, তখনও পর্যন্ত উপনিষদে ঈশ্বর হিসাবে ব্রহ্মাই অপ্রতিদ্বন্দ্বী, শিব বা বিষ্ণু তখনও আজকের মত অবস্থায় আসেনি।

তিনঃ প্রভাকর

এবারে আস্তিকদের (বেদপন্থি) মধ্যে যারা ঈশ্বরকে অস্বীকার করেন, তাদের একটু দেখি। এদের মধ্যে সাংখ্য ও মীমাংসার নাম উল্লেখ করা হয়। সাংখ্য ও মীমাংসার মধ্যে মীমাংসা অধিক চিত্তাকর্ষক, কেননা সাংখ্যকে বেদমূলক বলে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে শংকরাচার্য, রামানুজ প্রমুখ অগ্রণী আস্তিকেরা তীব্র আপত্তি তুলেছেন এবং সে আপত্তি ভিত্তিহীন নয়।

ঐতিহ্য অনুযায়ী মীমাংসা সম্প্রদায়টির প্রবর্টকের নাম জৈমিনি, মীমাংসা দর্শনের প্রাচীনতম গ্রন্থের নাম মীমাংসা-সূত্র এবং মীমাংসা-সূত্রের উপর সবচেয়ে বিখ্যাত ভাষ্যকারের নাম শবর। জৈমিনি ও শবরের পর প্রধান দার্শনিক দুজনঃ কুমারিল ভট্ট ও তাঁর শিষ্য প্রভাকর, এবং এ দুজনের মধ্যে মীমাংসা সূত্র ব্যাখ্যায় মৌলিক প্রভেদ থাকায় পরবর্তিতে ভট্ট-মীমাংসা ও প্রভাকর-মীমংসা নামে দুটি সম্প্রদায় তৈরি হয়।

যাহোক, প্রভাকর ও কুমারিলের মধ্যে নানা মৌলিক মতান্তর সত্বেও ঈশ্বর-প্রত্যাখান প্রসঙ্গে উভয়ের সম্প্রদায়ই একমত।

প্রথমে প্রভাকরদের যুক্তি দেখা যাক।

প্রভাকরদের 'প্রকরণপঞ্চিকা' গ্রন্থে জগত-স্রষ্টা অর্থে ঈশ্বর স্বীকার করা সম্ভব নয়, এই কথাটিই বিশেষভাবে প্রমান করবার আয়োজন হয়েছে। ইতিমধ্যে নৈয়ায়িকেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদনার্থে নানা যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছেন; প্রভাকরেরা প্রধানত এই নৈয়ায়িকদের ও সেই সাথে ন্যায়-বৈশেষিকদের যুক্তি খন্ডন করেই ঈশ্বরকে প্রত্যাখান করেছেন। এবার আসুন এই যুক্তিতর্কে প্রবেশ করি।
নৈয়ায়িকগণঃ জগত-স্রষ্টা হিসাবে ঈশ্বরের সত্তা অবশ্য স্বীকার্য; ক্ষিতি, জল প্রভৃতি সমস্ত সংহত বা জটিল বস্তুই কার্যাত্মক, কেননা এগুলো অবয়বদ্বারা গঠিত; এবং কার্য বলেই এগুলোর কারণ থাকতে বাধ্য এবং সেই কারণ কোনো বুদ্ধিমান কর্তা না হয়ে পারে না; অর্থাত পরমাণুপুঞ্জ থেকে সুসামঞ্জস্য ও নির্দিষ্ট আকারে ক্ষিতি, জল প্রভৃতি সংহত বা জটিল বস্তুগুলো কোন বুদ্ধিমান কর্তার নিয়ন্ত্রন ব্যতিত উত্পন্ন হতে পারে না; অতএব এই বুদ্দিমান কর্তা অর্থে জগতের নিমিত্তকারণ হিসাবে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর অনুমেয়- তাঁরই নিয়ন্ত্রনে সৃষ্টি ও প্রলয় ঘটে।

প্রভাকরগণঃ জাগতিক বস্তু অবশ্যই অবয়ব দ্বারা গঠিত, অতএব এগুলোর উত্পত্তি ও বিনাশ আছে।

শিক্ষক- রাসপতি মণ্ডল (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি) বঙ্গবাসী কলেজ , কোলকাতা ।

কিন্তু তাই বলে সামগ্রিকভাবে বিশ্বব্রহ্মান্ডের কোনো সৃষ্টি বা প্রলয়ের কথা কল্পনামাত্র; অতএব জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়ের নিয়ন্ত্রণকর্তা ঈশ্বরের পরিকল্পনাও অবান্তর। পক্ষান্তরে প্রাকৃতিক বস্তুগুলির দৃষ্টান্তে সুস্পষ্টভাবেই অভিজ্ঞতা হয় যে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক কারণেই সেগুলোর জন্ম হচ্ছে- যেমন মানুষ ও জীবজন্তুর দেহ শুধুমাত্র তাদের পিতামাতার দরুনই উত্পন্ন হয়। এবং এ-জাতীয় অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে অতীত ও ভবিষ্যতের উত্পাদন ব্যাখ্যা করা সম্ভব। অতএব, জাগতিক বস্তুগুলোর স্রষ্টা হিসাবে কোনো অতি-প্রাকৃত নিয়ন্ত্রতার কথা অনুমিত হয় না।

ন্যায়-বৈশেষিকগণঃ মানবদেহ বুদ্ধিবিহীন বলেই তার নিয়ন্ত্রণের জন্য এক বুদ্ধিমান স্রষ্টা বা ঈশ্বর অনুমেয়।

প্রভাকরঃ নিয়ন্ত্রণ-কার্য উদ্দেশ্যবিহীন হতে পারে না; কিন্তু এই তথাকথিত নিয়ন্ত্রণের পিছনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কি হতে পারে? কাষ্ঠাদি বস্তুর উপর সূত্রধরের নিয়ন্ত্রণ-কার্যর দৃষ্টান্ত অনুসারেই তাঁরা (নৈয়ায়িক/ ন্যায়-বৈশেষিকগ) জগত্স্রষ্টার নিয়ন্ত্রণ প্রমান করতে চান; সূত্রধর দেহবিশিষ্ট, তারই উপমান অনুসারে কল্পিত ঈশ্বরও দেহবিশিষ্ট বলে প্রমানিত হবেন। এবং তা যদি হয়, তাহলে দেহবিশিষ্ট বলেই তাঁর নিয়ন্ত্রণের/ পরিচালনার জন্য আরো কোনন স্বতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ-কর্তার কথা স্বীকৃত হতে বাধ্য- এবং এভাবে অনবস্থা দোষ ঘটবে।

এইভাবে প্রভাকরেরা স্রষ্টা বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব খন্ডন করেছেন। এবং তাঁরা সৃষ্টি এবং প্রলয় মানেননি বলেই বিশ্বজগত তাঁদের কাছে নিয়ত পরিবর্তনশীল ঘটনাস্রোত বলেই প্রতীত হয়েছে।

তবে মজার বিষয় হচ্ছে এই যে, শবর অনুভব করেছেন স্রষ্টার কথা স্বীকার করতে গেলে বেদ এর গুরুত্ব ক্ষুণ্ণ হবার আশংকা থাকে এবং বেদের চরম প্রামান্য স্বীকৃতিই মীমাংসার; অতএব স্রষ্টার কথা যুক্তিমূলকভাবে প্রত্যাখান করবার আয়োজন হয়েছে। তাই শবরের যুক্তিগুলোর মধ্যেই মীমাংসা-দর্শনে ঈশ্বর-প্রত্যাখানের সূত্রপাত দেখা যায়; যদিও ঈশ্বর-প্রত্যাখানের আরও সুস্পষ্ট যুক্তিতর্ক পরবর্তী রচনাতেই পাওয়া যায় এবং সেগুলোর দার্শনিক মূল্য উপেক্ষণীয় নয়। আমরা ইতিমধ্যে প্রভাকরদের যুক্তিতর্ক দেখছি, এবার দেখ ভাট্ট-মীমাংসকদের যুক্তি।

চারঃ ভাট্ট সম্প্রদায়

ভাট্ট-সম্প্রদায়েও বেদের চরম আপ্তত্ব প্রতিপাদন করবার উদ্দেশ্যেই ভাট্ট মীমাংসকেরাও সৃষ্টি ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব খন্ডন করেছেন। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো যে, এ জাতীয় রক্ষণশীল চাহিদায় উদ্ভাবিত হলেও স্বকীয় দার্শনিক গুরুত্বের দিক থেকে ভাট্ট মীমাংসকদের বিশেষত কুমারিলের যুক্তিগুলো ভারতীয় দর্শনের পটভূমিতে প্রায় বৈপ্লবিক। এবারে তাহলে কুমারিলের আলোচনার সংক্ষিপ্তসার উদ্ধৃত করা যাক।

কুমারিল বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতির (ঈশ্বর) পরিকল্পনা নিয়ে নানা রকম বিদ্রুপ করেছেন। "*যদি বল, কোন এক কালে বিশ্বব্রহ্মান্ড সৃষ্ট হয়েছিল তাহলে প্রশ্ন করব, সৃষ্টির আগে বিশ্বের অবস্থা কি ছিল? এবং বিশ্বই যদি তখন না থাকে তাহলে বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতিই (ঈশ্বর) বা কোথায় ছিলেন? তাঁর রূপই বা কিরকম ছিল? আর তখন তো কোন মানুষেরই অবস্থান সম্ভব ছিল না; তাই প্রজাপতি (ঈশ্বর) তখন যে*

শিক্ষক- রাসপতি মণ্ডল (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি) বঙ্গবাসী কলেজ , কোলকাতা ।

উপস্থিত ছিলেন এ কথা কার পক্ষেই বা জানা সম্ভব? এবং কেইই বা পরবর্তীকালে সৃষ্ট মানুষদের কাছে প্রজাপতির (ঈশ্বরের) কথা পৌঁছে দিতে পারেন? যদি বল, প্রজাপতির (ঈশ্বরের) পক্ষে কোন মানুষেরই প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানের বিষয় হওয়া সম্ভব নয়, তাহলে প্রশ্ন করবো তাঁর যে একান্তই কোনরকম অস্তিত্ব আছে সেকথাই বা জানা গেল কিভাবে?"

"তোমাদের মতে কোন এককালে বিশ্বের সৃষ্টি বা শুরু হয়েছিল; কিন্তু তা কিভাবে সম্ভবপর হতে পারে? প্রজাপতির (ঈশ্বরের) ইচ্ছায় সৃষ্টির শুরু হলো? কিন্তু সেকথা তোমারা কি করে বলবে? কেননা, তোমাদের মতেই স্রষ্টা দেহবিশিষ্ট নয়; এবং দেহ ছাড়া ইচ্ছা সম্ভবই নয়। তাই দেহবিহীন স্রষ্টার পক্ষে সৃষ্টি করার ইচ্ছাও অসম্ভব। যদি বলো, স্রষ্টার দেহ আছে, তাহলে সে দেহটিকেও তাঁরই সৃষ্টি বলতে পারো না। অতএব তাঁর দেহ সৃষ্টির জন্য আরেকটি স্রষ্টার কথা, আবার তাঁরও দেহ সৃষ্টির জন্য আরেকটি স্রষ্টার কথা- এভাবে অবিশ্রাম ভেবে যেতে হবে। স্রষ্টার দেহকে নিত্য বা অনাদিও বলা যায় না, কেননা সৃষ্টির পূর্বে ক্ষিতি, অপ্ প্রভৃতি দেহের উপাদানই যখন নেই তখন কী দিয়ে তাঁর দেহ নির্মিত হতে পারে?"

"তাছাড়া, প্রাণীদের পক্ষে নানারকম জ্বালা-যন্ত্রণায় পূর্ণ এই পৃথিবীটি সৃষ্টি করবার ইচ্ছাই বা তাঁর হলো কেন? এ-কথাও বলতে পার না যে প্রাণীদের কর্মফলের দরুনই এইসব জ্বালা-যন্ত্রণা। কেননা, সৃষ্টির পূর্বে এ জাতীয় কর্মফল সম্ভবই নয় এবং অতএব প্রাণীদের কর্মফল অনুসারে স্রষ্টার পক্ষে পৃথিবী সৃষ্টি করাও সম্ভব নয়।"

"উপকরণাদি ব্যতিরেকেও সৃষ্টি সম্ভব নয় এবং সৃষ্টির পূর্বে এ-জাতীয় উপকরণ বলে কিছুর অস্তিত্ব অসম্ভব। উর্ণনাভ বা মাকড়সার জালও উপাদানহীন সৃষ্টি নয়, কেননা ভক্ষিত পতঙ্গ থেকে মাকড়সার লালা উত্পাদন হয় এবং জালের উপাদান হিসাবে এই লালা ব্যবহৃত।"

বৈশেষিকেরা যে মনে করেন, ঈশ্বরের ইচ্ছায় অকস্মাত সৃষ্টি- কুমারিলের মতে তা সম্ভব নয়; কেননা *"ঘট প্রভৃতি নির্মাণের দৃষ্টান্তে দেখা যায় একটি বস্তুর নির্মাণ ক্রমপদ্ধতি মাত্র। দ্বিতীয়ত বিশ্বব্রহ্মান্ডের প্রলয় স্বীকার করা যায় না, কেননা তার কোন প্রমান নেই। তাছাড়া প্রলয়ের কথা স্বীকার করলে মানতে হবে যে ঈশ্বরের মনে প্রলয়ের ইচ্ছা জাগে; কিন্তু এ জাতীয় ইচ্ছায় লাভ কী? অর্থাত কোনো বুদ্ধিমান স্রষ্টার পক্ষেই নিজের সৃষ্টিকে ধ্বংস করবার ইচ্ছা জাগা সম্ভব নয়।"*
"তোমাদের মতে তাঁর মধ্যে সৃষ্টির ইচ্ছা জেগেছিল; কিন্তু বলতে পার কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থর জন্য তাঁর এই ইচ্ছা জেগেছিল- এমন কোন উদ্দেশ্যই বা সম্ভব হতে পারে যা কিনা সৃষ্টি-ব্যতিরেকে চরিতার্থ হওয়া অসম্ভব? নির্বোধও উদ্দেশ্য-বিহীন কাজ করে না। অতএব তিনি যদি বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করে থাকেন তাঁর বুদ্ধিকে নিস্ফল বলতে হবে। যদি বল, এই সৃষ্টি তাঁর লীলা- প্রমোদ বা বিলাসমাত্র, তাঁকে আর সদানন্দ বা চিরসন্তুষ্ট বলতে পার না (অর্থাত সৃষ্টির পূর্বে তিনি নিশ্চয়ই প্রমোদের অভাব অনুভব করেছিলেন)।"

শিক্ষক- রাসপতি মণ্ডল (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি) বঙ্গবাসী কলেজ , কোলকাতা ।

"বৈশেষিকেরা বলেন, সকলের দেহই বুদ্ধিমান দেহর নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু এই যুক্তি অনুসারে ঈশ্বর-দেহের নিয়ন্ত্রণ-কর্তা কে হবেন?"

ঈশ্বর এবং সৃষ্টি-প্রলয় সংক্রান্ত বৈশেষিক মত খন্ডন করেই কুমারিল ক্ষান্ত নন; এই প্রসঙ্গে তিনি বৈদান্তিক সৃষ্টিতত্বকেও খন্ডন করতে অগ্রসর হয়েছেন। *"নিত্য শুদ্ধ বা পরম পবিত্র পুরুষ (ব্রহ্ম বা পরমাত্মা) থেকেই যদি জগতের সৃষ্টি হয়, তাহলে জগতটিও তো পরম পবিত্র বা বিশুদ্ধ হওয়ার কথা; কিন্তু জগতে পাপাদি দোষ বা অশুদ্ধতা বর্তমান"। "যদি বলা হয়, জগতের পাপাদি মানুষের অতীত অধর্মের ফল (অতএব এগুলোর জন্য নিত্যশুদ্ধ পরমাত্মা দায়ী নন), তাহলে"*, কুমারিল উত্তর দিচ্ছেন, *"মানুষের এই অধর্ম তো তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন; অতএব পরম পবিত্র পরমাত্মার পক্ষে মানব ধর্মাধর্মকে সুনিয়ন্ত্রিত করে একটি পরম নিষ্কলুষ জগত সৃষ্টি করাই উচিত ছিল।"*

বৈদান্তিকেরা বলে, জগত সৃষ্টির মূলে অবিদ্যা বা মায়া। কিন্তু কুমারিলের মতে এ কথা যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। কেননা *"তাঁদের মতে সৃষ্টির সময় ঈশ্বর (বা ব্রহ্ম) ছাড়া আর কিছুরই সত্বা ছিল না; আর যদি তাইই হয় তাহলে কিসের প্রভাবে এই মায়ার পক্ষে কার্যকরী হওয়া সম্ভব? মায়া হলো স্বপ্নের মত মিথ্যা এবং ব্রহ্ম বিশুদ্ধ; তাই একথা বলা যায় না যে ব্রহ্মই এ মায়াকে সৃষ্টিকার্যে প্রণোদিত করেন।"*

সংক্ষেপে, প্রভাকর ও কুমারিল উভয়েই সামগ্রিকভাবে জগতের সৃষ্টি বা প্রলয় স্বীকার করেননি; বিভিন্ন জাগতিক বস্তুর উত্পত্তি ও বিনাশ উভয়ের মতে জাগতিক কারণ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। ঐকান্তিক অর্থে বেদপন্থী বলেই মনে হতে পারে সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর অস্বীকার করলেও মীমাংসকেরা অন্তত বৈদিক দেবতাদের কর্তৃত্বে বিশ্বাসী হবেন, এবং এই অর্থে তাঁদের মত বহু-দেববাদী হওয়াই সম্ভব। কিন্তু আপাত বিস্ময়ের কথা, মীমাংসকেরা বৈদিক দেবতাদের কর্তৃত্ব – এমনকি তাঁদের সত্বাও – সম্পূর্ণ ভাবেই অস্বীকার করেছেন।

পাঁচঃ **চার্বাক**

এতক্ষণ, আমরা বেদপন্থী আস্তিক নিরীশ্বরবাদীদের মধ্যে মীমাংসকদের আলোচনা দেখলাম। এবারে আবারো একটু বেদ-বিরোধীদের দেখি। এবারে চার্বাক প্রসঙ্গ।

চার্বাক। নামান্তরে লোকায়ত বা বার্হস্পত্য (বৃহস্পতি-প্রতিষ্ঠিত) দর্শন। চার্বাক বা লোকায়ত বলতে প্রাচীণকালের কোনো এক বস্তুবাদী বা জড়বাদী বা দেহবাদী দার্শনিক সম্প্রদায় বোঝাত। আধুনিক যুগের বস্তুবাদের সাথে ঐ প্রাক-বৌদ্ধ যুগের সুপ্রাচীণ বস্তুবাদের অভিন্নত্ব প্রত্যাশা করা যায় না; তবু নিঃসন্দেহে বলা যায় এই সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা আত্মা অস্বীকার করে জড়দেহকেই চূড়ান্ত সত্য মনে করেছিলেন এবং তাঁদের মতে ঈশ্বর ও পরলোকের কথা কল্পনামাত্র। তাঁরা দাবি করেছেন, বেদ বা শ্রুতির কোনো প্রামান্য নেই, এবং বৈদিক যাগযজ্ঞ শুধু অর্থহীনই নয়- প্রবঞ্চনামূলকও।

শিক্ষক- রাসপতি মণ্ডল (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি) বঙ্গবাসী কলেজ , কোলকাতা ।

এই দর্শনের আলোচনায় সবচেয়েও বড় সমস্যায় পড়তে হয় তা হচ্ছে লোকায়ত সংক্রান্ত তথ্য অত্যন্ত বিরল এবং এগুলি একান্তই খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত। লোকায়তিকদের নিজস্ব কোন রচনাই খুঁজে পাওয়া যায় না (গার্বে, তুচি, দাসগুপ্ত প্রমুখের মতে লোকায়তিকদেরও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ ছিল; এটা মেনে নিলেও বলতে হবে যে, তা বিলুপ্ত- সম্ভবত বিপক্ষেরা সেগুলো স্বেচ্ছায় ধ্বংস করেছিল)। সুতরাং চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন সম্পর্কে আমাদের একমাত্র সম্বল বলতে বিরোধী সম্প্রদায়গুলির লোকায়ত খণ্ডন। সুতরাং বলতেই হচ্ছে, এ সম্প্রদায়ের এমনই দুর্ভাগ্য যে একমাত্র বিপক্ষের রচনা থেকেই আমাদের একে বোঝবার চেষ্টা করা সম্ভব।

স্বভাবতই বিপক্ষের প্রধান উৎসাহ লোকায়ত খণ্ডন- লোকায়ত বর্ণন নয়। ফলে এই সূত্রে লোকায়ত সংক্রান্ত যেটুকু তথ্য পাওয়া যায় তা যে অবিকৃত এবং নৈর্ব্যক্তিক হবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা বিভিন্ন সমস্যা-প্রসঙ্গে লোকায়ত খণ্ডনের আয়োজন করেছেন; ফলে তাদের রচনায় লোকায়ত-সংক্রান্ত যেটুকু তথ্য পাওয়া যায় তাও নেহাতই খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত- লোকায়তের কোনো সামগ্রিক বা ধারাবাহিক পরিচয় নয়। একমাত্র মাধবাচার্যের সর্বদর্শন সংগ্রহ, শংকরাচার্য রচিত বলে খ্যাত সর্বসিদ্ধান্ত সংগ্রহ এবং হরিভদ্রসুরীর ষড়দর্শনসমুচ্চয়- প্রধানতই প্রথম গ্রন্থটি – এই উক্তির আপাত ব্যতিক্রম। মাধবাচার্যের সর্বদর্শনসংগ্রহে যে লোকায়ত আলোচনা পাই, সেটিও মূলত লোকায়তের খণ্ডন। তারপরেও মাধবাচার্যের এই গ্রন্থের উপর নির্ভর করতে হয় এই কারণে যে, এখানেই লোকায়তের তুলনামূলক পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়। আসলে মাধবাচার্য তার দর্শন-গ্রন্থটি লিপিবদ্ধ করার সময় লোকায়ত মতকে খণ্ডন করার তাগিদ বোধ করেন, কেননা তার মতে লোকায়ত খণ্ডন করতে না পারলে দর্শন গ্রন্থটি পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারবে না। এবং শেষ পর্যন্ত তাকে স্বীকার করতে হয় যে, এই লোকায়ত খন্ডন নিতান্ত সহজ সাধ্য কোন কাজ নয়। **"দুরুচ্ছেদং হি চার্বাকস্য চেষ্টিতম"। অর্থাৎ চার্বাক মত উচ্ছেদ করা নেহাত চাট্টিখানি কথা নয়।**

এবারে তাহলে এই চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনের কিছু আলোচনার দিকে দৃষ্টি দেয়া যাকঃ

আত্মা বস্তুজাত বলে চার্বাক মনে করতেন- *"পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু এই চতুর্ভূত। চার ভূত থেকেই চৈতন্য উৎপন্ন হয়, যেমন (উপযোগী সামগ্রী)..... থেকে মদ্যের শক্তি (মাদকতা)।"* [কায়াদেব ততো জ্ঞানম প্রাণাপানাদ্যধিষ্ঠিতাত। যুক্তম জায়ত ইত্যেতত কম্বলাশ্যতরোদিতম। । (সর্বদর্শন-সংগ্রহ)]

আশ্চর্য সরল উদাহরণ দিয়ে তারা ব্যাপারটি বুঝিয়ে দিতে চান: *কিন্বাদিভ্যঃ সমতেভ্যো দ্রব্যেভো মদশ্চক্তিবৎ। কিন্ব (সুরাবীজ) ইত্যাদি কয়েটি দ্রব্য একত্রে মেশানোর ফলে যে-রকম মদশক্তির আবির্ভাব হয়, ঠিক সেই রকম।* আরেকটি এরকম সরল উদাহরণ চার্বাকপন্থীদের নামে প্রচলিত আছে: *পান, চুন, খয়ের, সুপুরি- এগুলোর কোনটার মধ্যেই টুকটুকে লাল রঙ নেই, অথচ এগুলি দিয়ে পান সেজে মুখে দিলে পর ঠোঁট দুটি টুকটুকে লাল হয়ে যায়। লাল রঙ এলো কোথা থেকে? এ রং পান-চুন-খয়ের-সুপুরি ছাড়া কিছুই নয়, অথচ পান-চুন-খয়ের-সুপুরির উপর এক অপূর্ব আবির্ভাব বৈকি। ঠিক তেমনি ক্ষিতি, তেজ, অপ, মরুৎ ছাড়া মানুষ আর কিছুই নয়, তবু এই চতুর্ভূতের এক বিশেষ সমাবেশের ফলেই চেতনা নামে ওই অপূর্ব গুনের আবির্ভাব।*

শিক্ষক- রাসপতি মণ্ডল (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি) বঙ্গবাসী কলেজ , কোলকাতা ।

সৃষ্টির জন্য নির্মাতার আবশ্যকতা নেই, একে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে: *"অগ্নি গরম, জল ঠাণ্ডা এবং বায়ু শীতল স্পর্শযুক্ত। কে এসব সৃষ্টি করেছেন? এগুলি তাদের বস্তুধর্ম বা স্বভাবানুযায়ীই হয়েছে।" ("কায়াদেব ... রোদিতম") বিশ্বসৃষ্টি তার স্বভাব থেকেই হয়, এর জন্য তার কর্তাকে অনুসন্ধান করা অনাবশ্যক- "কন্টকের তীক্ষ্ণতা, মৃগ বা পক্ষীর রূপ বৈচিত্র কে করেন? এসবই স্বভাব থেকে হয়।"* (সাংখ্যকারিকার মাঠর ভাষ্য)

"আত্মা, স্বর্গ, নরক, পরলোক কোথাও যায় না। বর্ণাশ্রমাদির সকল ক্রিয়াই নিস্ফল। মৃতের উদ্দেশে প্রেতকার্য প্রভৃতি ব্রাহ্মনদের জীবনোপায় ছাড়া কিছু নয়। যারা তিন-তিনটে বেদ রচনা করেছে তারা বেবাক ভণ্ড-ধূর্ত-নিশাচরের দল।"

"জ্যোতিষ্টম যজ্ঞে যদি নিহত পশু সোজা স্বর্গেই যায়, তা হলে যজমান কেন নিজের বাপকে হাড়িকাঠে ফেলে না? শাদ্ধপিণ্ড যদি পরলোকগত মানুষের পেট ভরাতে পারে, তাহলে কেউ বিদেশ যাত্রার সময় তার সঙ্গে চিড়েমুড়ি বেঁধে দেবার আর দরকার কি? (ঘরে বসে তার উদ্দেশ্যে পিণ্ডি দিলেই চলা উচিত; হাজার হোক পরলোকের চেয়ে ইহলোকের দেশান্তর অনেক কাছের-পিঠের ব্যাপার)। আত্মা যদি দেহ থেকে নির্গত হয়ে পরলোকে যেতে পারে তবে আত্মীয়বন্ধুর স্নেহে ব্যাকুল হয়ে কেন পুনরাগমন করে না? ... ব্রাহ্মনগণ নিজেদের জীবিকার্জনের উপায় হিসেবেই মৃতের শ্রাদ্ধাদির বিধান দেন।" (সর্বদর্শন-সংগ্রহ, চার্বাক দর্শন)

বুঝাই যাচ্ছে, এই দর্শনের আশ্চর্য ক্ষমতা এর সারল্য। ভারী জ্ঞানের কচকচানি নেই, ভাষার মারপ্যাচ নেই- সহজ সরল ভাষায়, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় আশ্চর্য জীবনবোধ দিয়েই এই দর্শনের যেন পথচলা। হবেই না বা কেন? এ যে সাধারণ জনমানুষের দর্শন- নিম্নবর্গীয় লোকের, পুরোহিত শ্রেণীর কাছে নির্যাতিত মানুষের দর্শন। সেজন্যেই এর নাম লোকায়ত দর্শন। এ মতবাদের প্রচলন ঠিক বৈদিক যুগের ঠিক পরেই, পুরোহিত শ্রেণী তখন অনেকাংশে দেশের শাসক সম্প্রদায়, তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহই চার্বাকদের মূল প্রেরণা।

ফলে, এই দর্শনকে, এই সম্প্রদায়কে মোকাবেলা হতে হয় পুরোহিত শ্রেণীর রক্তচক্ষুকে। পুরোহিত শ্রেণী তথা শাসক গোষ্ঠী যে এই সম্প্রদায়ের উপর খড়্গহস্ত ছিল, তার প্রমাণ- তাদের স্বকীয় কোন গ্রন্থ আজ পাওয়া যায় না, পূর্ণাঙ্গ কোন তথ্য মেলাও আজ ভার। সাথে এটাও লক্ষণীয় যে, সাধারণ নিম্নবর্গের দর্শন হওয়াতে একেবারে নিশ্চিহ্নও করা সম্ভবপর হয়নি। আজও আমরা গ্রামে-গঞ্জে প্রবাদ-প্রবচনে যেসমস্ত বস্তুবাদী ছোঁয়া পাই তা তো এই দর্শনের ফল। "রাখে আল্লা মারে কে" এর বিপরীতে "সাবধানের মার নাই" বা "ভাগ্যের লিখন না যায় খণ্ডন" এর বিপরীতে "", "ঝোপ বুঝে কোপ মারো", "সময়ের এক ফোঁড় কি অসময়ের নয় ফোঁড়", এসব তারই সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু এটাও ঠিক যে, শেষ পর্যন্ত চার্বাকদের বা লোকায়তিকদের দমিয়ে রাখতে, এই সম্প্রদায়ের নিদর্শন মুছে ফেলতে পুরোহিত তন্ত্র সফলকাম হয়। আর, এ থেকেই বুঝা যায় লোকায়ত মত পুরোহিত শ্রেণী বা বাহ্মণ্যবাদকে যে কতখানি ব্যতিব্যস্ত-তটস্থ করে রেখেছিল।

লোকায়তদের প্রতি পুরোহিতদের রাগের বহিপ্রকাশ আমরা তাদের প্রচারিত ধর্ম গ্রন্থ- দর্শন গ্রন্থে পাই। পুরাণ সাহিত্যে তাই চার্বাক দর্শনের কথিত প্রতিষ্ঠাতা বৃহস্পতিকে অন্য ভূমিকায় দেখা যায়। একবার দেবতাদের সাথে অসুরদের মারাত্মক এক যুদ্ধ হয়েছিল- যেখানে কোনমতেই দেবতারা পেরে উঠছিল

শিক্ষক- রাসপতি মণ্ডল (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি) বঙ্গবাসী কলেজ , কোলকাতা ।

না। তখন বৃহস্পতি মুনি অসুরদের মধ্যে গিয়ে এই দর্শনের প্রচার করে, এতে অসুরদের পতন ঘটে এবং দেবতারা জয় লাভ করে! শুধু তাই নয় চার্বাক বা লোকায়তিকদের ভোগসর্বস্ব, লোভী, নীতিবিবর্জিত হিসাবে দেখানোর এবং প্রচারের মহান(!) কর্তব্য তারাই পালন করে। চার্বাক নামটির মধ্যেও সে বিষয়টিই আমরা পাই, চার্বাক শব্দটি এসেছে চর্বন থেকে, খাওয়া-দাওয়া তথা ভোগসর্বস্ব জীবন যাপন যারা করে তারাই চার্বাক। (আজও আস্তিকরা নাস্তিকদের এমন ভোগবাদী-নীতিবর্জিত বলে প্রচার করে, যেনবা পরলোকের লোভ আর ভয় ছাড়া ইহলোকে নৈতিকতা সম্ভবই নয়!!)।

আসলে, এ পুরোহিতদের এ রকম প্রচারণার কোনরূপ সত্যতা নেই। কেননা, প্রকৃত লোভী-ভোগী ছিল পুরোহিতরা, তারা তাদের ভোগের স্বর্গ টিকিয়ে রাখার জন্যই পুরোহিততন্ত্র তথা ধর্মকে টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিল। আর উল্টোদিকে লোকায়ত মত ছিল নিম্নবর্গের মানুষের মতবাদ, তাদের ভোগসর্বস্ব জীবন যাপন কল্পনা মাত্র। ফলে, চার্বাক দর্শনের যেসমস্ত আলোচনা, বক্তব্যকে আপাত ভোগবাদী মনে হয়- সেগুলোকে ইতিহাসের বিশেষ বাস্তবতার নীরিখেই বিচার করা দরকার। "ধার করে হলেও ঘি খাও" চার্বাকদের নামে বহুল প্রচলিত এই উক্তিকে সত্যি ধরে নিলেও পুরোহিততন্ত্রের বিপরীতে একে দেখলে সম্ভবত একই রকম ভোগসর্বস্ব মনে হওয়ার কথা নয়। যেমনঃ

পুরোহিততন্ত্র: ধার করে হোক আর যেমন করেই হোক- পিতৃশ্রাদ্ধের দিন পুরোহিত ভোজন করাতে ভুললে চলবে না।

লোকায়ত:: ধার করে হোক করেই হোক আর যেমন করেই হোক নিজের পেট টাকে ঠাণ্ডা রাখাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ। 'ধার করে হলেও ঘি খাও'।

পুরোহিততন্ত্র: এ পৃথিবী কেবল দুঃখময়, তাই ভোগান্বেষণ করতে গেলে শেষ পর্যন্ত দুঃখের জালেই জড়িয়ে পড়তে হবে।

লোকায়ত:: মাছ খেতে গেলে গলায় কাঁটা বেঁধবার ভয় নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তাই বলে কি মাছ খাবার চেষ্টাই করবে না? জড়জগতই যেহেতু একমাত্র সত্য সেহেতু ইহলোকের সুখভোগই মানুষের একমাত্র পুরুষার্থ। দেহ একবার ভস্মীভূত হলে পুনরাগমনের আর সম্ভবনাই নেই- অতএব যতদিন বাঁচা যায়, সুখে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে।

এই "ইহকালের ইহলোকের সুখভোগই মানুষের একমাত্র পুরুষার্থ"কে পুরোহিত তন্ত্রের ভোগবাদীতার বিরুদ্ধে নিম্নবর্গীয় লোকেদের পাল্টা জবাব হিসাবেই দেখতে হবে। কেননা এতদিন পরলোকের সুখভোগের মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে ইহলোকের সুখলাভ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে নিম্নবর্গের মানুষদের, আর সে সুযোগে পুরোহিত-তন্ত্র ইহলোকেই গড়ে তুলেছে সুখভোগের স্বর্গ!

শিক্ষক- রাসপতি মণ্ডল (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি) বঙ্গবাসী কলেজ , কোলকাতা ।

আর, সহজবোধ্যতা- সারল্য- বিশুদ্ধ জ্ঞানের বোঝাকে ছাপিয়ে অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির মিশেলে জগৎ-সংসারকে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা -এসব কিছুর চেয়েও তাই লোকায়ত দর্শনের এই তেজ, এই বিদ্রোহের জন্য এই দর্শন অনন্য।